শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকি। এইহেতু আমি তোমাদিগকে বুঝিতে বলি যে, যদিও বেদান্ত চূড়ান্তভাবে কার্যকর বটে, কিন্তু সাধারণ অর্থে নহে ; উহা আদর্শ-হিসাবে কার্যকর। ইহার আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, ইহা কোন অসম্ভব আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করে না, অথচ এই আদর্শই "আদর্শ" নামের উপযুক্ত। এক কথায় ইহার উপদেশ "তত্ত্বমসি"—"তুমিই সেই ব্রহ্ম"—ইহাই সমুদয় উপদেশের শেষ পরিণতি (পর্যবসান)।'[১৬] বলা বাহুল্য যে, 'আদর্শ' শব্দটি এই স্থলে চরম লক্ষ্য বা চরম জ্ঞান অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। বেদান্তের যাহা চরম উপদেশ ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞান তাহা অসাধ্য নহে, সুসাধ্য (practicable), অর্থাৎ তাহা আয়ত্ত করা—উপযুক্ত সাধনের দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব। বেদান্তের চরম উপদেশ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান একটা অসাধ্য অসম্ভব উপদেশ নহে। অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত হইবার যোগ্য (capable of being practised)—এই একটি বিশেষ অর্থেও বিবেকানন্দ practical কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলা যায় যে বেদান্তের চরমতত্ত্ব বা উপদেশ যে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান তাহার অসাধ্যস্বরূপ অপ্রামাণ্য নাই।

practical কথার তৃতীয় অর্থ feasible বা practicable, জীবনে আয়ত্ত করা অসম্ভব নহে ; অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করা সম্ভব

চতুর্থ আর একটি অর্থে বিবেকানন্দের practical বেদান্তের অর্থ বুঝিতে হইবে। ইহাই বোধ হয় সর্বোচ্চ ভাবের অভিনব অথচ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত অর্থ। অদ্বৈতবেদান্তের চরম প্রতিপাদ্য একটি শুদ্ধ তত্ত্ব বা একটি সিদ্ধান্ত। যিনি 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মাই ব্রহ্ম, 'তত্ত্বমসি'—'তুমিই তিনি' এই অদ্বৈত তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার অবশ্যই সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা সর্বভূতে আত্মদর্শন হইয়া সকলের প্রতি পূজাবুদ্ধি বা সেবাবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। তিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'[১৭] —সর্বদা মানুষের হৃদয়ে বিশেষভাবে অবস্থিত সেই পরমাত্মাকে—ঈশ্বরকে প্রেমপূর্বক সেবা করিতে উন্মুখ হইয়া থাকেন। ইহাই সিদ্ধের লক্ষণ হইলেও সাধকের ইহা সাধন বা উপায়। ইহাই বিবেকানন্দের শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। ভগবদ্‌গীতায় স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে :

সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন বা ব্রহ্মদর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ—সর্বভূতের হিতসাধন

প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্তের চতুর্থ ও শ্রেষ্ঠ অর্থ শিবজ্ঞানে জীবসেবা

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥[১৮]

—অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় নিষ্পাপ দ্বিধাহীন ঋষিগণ সর্বভূতের হিতে রত থাকিয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।

১৬ বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২২
১৭ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ২।১৩
১৮ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ৫।২৫

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥[১৯]

—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলকে সম্যক সংযত করিয়া সর্বত্র (সকল প্রাণীতে) সমবুদ্ধিবিশিষ্ট (ব্রহ্মবুদ্ধিযুক্ত) হইয়া, সকল ভূতের (প্রাণীর) হিতে রত থাকিয়া তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। এমনকি বেদের মন্ত্রভাগে ঋগ্বেদেও সকল মানুষের কল্যাণ ও সুখ প্রার্থনা করিয়া বলা হইয়াছে : 'মানুষ যেন সর্বপ্রকারে অর্থের চেষ্টা করে, তারপর যেন সত্যের পথে পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, যেন সে নিজ কর্মের দ্বারা কল্যাণের ভাগী হয়, যেন মনে সে সুখ পায়।'[২০] এমনকি জ্ঞান-ভক্তির শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে : 'সর্বভূতে অবস্থিত আত্মারূপে ঈশ্বরের সেবা না করিয়া যাঁহারা শুধু অর্চার (বিগ্রহের) পূজা করেন, তাঁহারা ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করেন।'[২১]

'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'র এই মন্ত্র বিবেকানন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার তত্ত্বদ্রষ্টা গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে। উপলব্ধ এই তত্ত্বটি স্বরচিত প্রসিদ্ধ কবিতায় অপূর্বভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।[২২]

শিবজ্ঞানে জীবের সেবা সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের যেমন একটি প্রকৃষ্ট লক্ষণ, তেমনি ইহা অদ্বৈতজ্ঞান লাভের একটি প্রকৃষ্ট সাধন। ইহাকে অদ্বৈততত্ত্বের জীবনে প্রয়োগ—সুতরাং প্রয়োগাত্মক (practical) বেদান্ত বলা যাইতে পারে। আচার্য শঙ্করও এই দেহকে দেবালয় এবং দেহে অবস্থিত আত্মাকে সদাশিব দেবতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,* এবং প্রকৃত জ্ঞানী বা মুমুক্ষু সাধুর লক্ষণ বলিয়াছেন : 'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ'[২৩]—অর্থাৎ (সাধুরা) বসন্ত ঋতুর ন্যায় মানবগণের উপকার সাধন করিয়া থাকেন। বিবেকানন্দ বলিতেছেন : 'যে-মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যদেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব, যে-মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যের সম্মুখে শ্রদ্ধা সহকারে দাঁড়াইতে পারিব, আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিব, যে-মুহূর্তে আমার ভিতরে এই ভাব আসিবে, সেই মুহূর্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' ব্রহ্মদর্শনের লক্ষণও, আবার অদ্বৈতজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট সাধন

১৯ তদেব, ১২।৪
২০ ঋগ্বেদ, ১০।৩৯।২
২১ শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।২৯।২২
২২ বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৯
* 'দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ।' আত্মপূজা, ৮
২৩ বিবেকচূড়ামণি, ৩৭

সর্বস্তরের মানুষই আত্মচিন্তা বা ব্রহ্মচিন্তার দ্বারা উপকৃত হইবে। অবশ্য, তাঁহাদের মানসিক উদ্দেশ্য ও অবস্থা অনুসারেই তাঁহারা ব্রহ্মাত্মচিন্তার ফল কম-বেশী—উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট লাভ করিবেন। এই অর্থেই বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: 'যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর; টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেইদিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হইবে। যদি তুমি মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে—তাহা হইলে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে, পরমানন্দস্বরূপ নির্বাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভুল হইয়াছিল যে, এতদিন অদ্বৈতবাদ কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল—অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় নাই। এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে।'[১২] আবার অন্যত্র বলিয়াছেন: 'তবু লোকের মন হইতে এ-সংস্কার এখনও যায় নাই যে, উপনিষদে কেবল সন্ন্যাসীদের আরণ্যক জীবনের কথাই আছে।...গীতায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বেদান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। তুমি যে-কাজই কর না কেন, তোমার পক্ষে বেদান্তের প্রয়োজন (আত্মতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োজন)। বেদান্তের এই-সকল মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত হইবে।...উপনিষদ্-নিহিত তত্ত্বাবলী জেলে-মালা প্রভৃতি জনসাধারণ কিভাবে কার্যে পরিণত করিবে?...যে যতটুকু পারে, করুক। জেলে যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে; ছাত্র যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল আইনজ্ঞ হইবে। এইভাবে অন্যান্য সর্বত্র।'[১৩] অন্যত্র আরও বলিয়াছেন: 'আর এক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে—কর্মজীবনেই ব্রহ্মোপলব্ধি বা ব্যবহারিক জীবনে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োগ।'[১৪] ইহাই গিরিগুহা ও অরণ্য হইতে বেদান্তকে সংসারে ও সমাজে বাহির করিয়া আনা।

ব্যবহারিক জীবনের সর্বত্র বেদান্তের বা আত্মচিন্তার প্রয়োগে সুফল

ইহাতে রক্ষণশীল কাহারও মনে হইতে পারে যে, নীচজাতিদের কি বেদান্ত শ্রবণে, ব্রহ্মাত্মচিন্তায় অধিকার আছে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, স্মৃতিশাস্ত্রকার মনুও বলিয়াছেন: 'অন্ত্যাদপি পরং ধর্মম্'—অর্থাৎ চণ্ডালাদি নীচজাতি হইতেও পরধর্ম অর্থাৎ মোক্ষধর্ম বা তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করিবে। নীচজাতির যদি পরধর্ম অনুশীলনে ও পরতত্ত্বজ্ঞানে অধিকারই না থাকে, তবে তাহা হইতে পরধর্ম গ্রহণ কি করিয়া সম্ভব? রক্ষণশীল শঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন যে, যদিও শূদ্রাদি নীচজাতির বেদপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যায়

১২ তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪ ১৩ তদেব, পৃঃ ১৩৭

১৪ তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৪০

অধিকার নাই, তথাপি স্মৃতি-পুরাণাদির সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে তাঁহাদের মুক্তি কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্করের আর একটি মনু-স্মৃতির উদ্ধৃতিও লক্ষণীয় এবং স্মরণীয় যে, তাহারাই শূদ্র যাহাদের পাপ বলিয়া কিছু নাই, এবং যাহাদের কোনও প্রকার 'সংস্কার' নাই—'ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কারমর্হতি।'[১৫] এইরূপ শূদ্র এক্ষণে বিরল।

প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্তের দ্বিতীয় অর্থ এই যে, বেদান্ত বলিতে কেবলমাত্র তাহার চরম প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মতত্ত্বই বুঝায় না। বেদান্তের যে সাধন শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান, এবং অন্যান্য তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, সত্য প্রভৃতি সে সবও বেদান্তের অন্তর্গত—বেদান্তদর্শনে 'সাধন অধ্যায়' নামে একটি অধ্যায়ই রহিয়াছে। সুতরাং অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মতত্ত্বে কর্মানুপ্রবেশ অসম্ভব হইলেও বেদান্তের সাধনাংশ সম্পূর্ণরূপেই অনুষ্ঠানসাপেক্ষ—সম্পূর্ণ অভ্যাসসাপেক্ষ, practical। লক্ষণীয় যে বিবেকানন্দ 'কর্মজীবনে বেদান্ত'-শীর্ষক ভাষণগুলিতে ত্যাগ, বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থতা, প্রেম প্রভৃতি এবং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি সাধনেরও আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং practical বেদান্তের দ্বিতীয় অর্থ—বেদান্তের সাধনের অনুষ্ঠান ও অভ্যাস করিয়া ঐগুলিকে (ত্যাগ, বৈরাগ্য, শমদমাদিকে) জীবনে পরিণত অর্থাৎ আয়ত্ত করা। তাই বিবেকানন্দ পুনঃ-পুনঃ বলিয়াছেন যে বেদান্তকে জীবনে পরিণত করিতে হইবে, নতুবা উহা বুদ্ধির ব্যায়ামমাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। কেবলমাত্র বুদ্ধিস্থিত মতবাদ চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর করাইতে পারিবে না। 'যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।'

প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্তের দ্বিতীয় অর্থ—বেদান্তের সাধন শমদমাদির অভ্যাস করিয়া জীবনে পরিণত অর্থাৎ আয়ত্ত করা

তৃতীয় আর একটি অর্থে বিবেকানন্দ চরমতত্ত্ব সম্বন্ধেই 'প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্ত' কথাটির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা স্পষ্টরূপেই করিয়াছেন। তাহাতে 'কার্যকর' কথাটির অর্থ—আয়ত্ত করা সম্ভব বা জীবনে আয়ত্ত করা সম্ভব। অদ্বৈতবেদান্ত আয়ত্ত করা অসম্ভব—এমন কোন তত্ত্ব বা আদর্শ উপস্থাপিত করে নাই। ঐ তত্ত্বের উপলব্ধি বা অপরোক্ষানুভূতি উপযুক্ত সাধনার দ্বারা সম্ভব। বিবেকানন্দ বলিতেছেন: "'শাস্ত্রনিষ্ঠা" কথাটির অর্থ যেমন নিজ উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল করিয়া করা হয়, অর্থাৎ আমি যাহা বুঝি তাহাই শাস্ত্রীয়, আর তোমার মত অশাস্ত্রীয়—"কার্যকর" (practical)-কথাটির অর্থও ঐরূপ করা হইয়া থাকে। আমি যাহা কাজে লাগাইবার মতো বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই একমাত্র কার্যকর।...তোমরা দেখিতেছ, আমরা সকলে কেমন যাহা পছন্দ করি ও করিতে পারি, শুধু সেই বিষয়েই এই "কার্যকর"

১৫ মনুসংহিতা, ১০।১২৬

তবে কার্যে পরিণত বেদান্ত বলিতে তিনি কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহার অন্যতম ব্যাখ্যা তিনি নিজেই স্পষ্ট ভাষায় দিয়াছেন : 'এইরূপে নানা দিক হইতে দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই দর্শনের আলোকে জীবনগঠন ও জীবনযাপন করা অবশ্যই সম্ভব। আর যখন আমরা পরবর্তী কালের ভগবদ্‌গীতা আলোচনা করি··· ইহা বেদান্ত দর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য—তখন দেখিতে পাই, আশ্চর্যের বিষয় যুদ্ধক্ষেত্র এই উপদেশের স্থান বলিয়া নির্বাচিত হইয়াছে, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন, আর গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই মত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে—তীব্র কর্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার চিরশান্ত ভাব! এই তত্ত্বকে "কর্মরহস্য" বলা হইয়াছে, এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য।'[৭] সমাজে এবং কর্মজীবনেও বেদান্তের প্রয়োগ সম্ভব এবং উপযোগিতা আছে—ইহা বুঝাইবার জন্য আরও বলিয়াছেন : 'এইরূপে আমরা অনেক উপনিষদে এই কথা পাইতেছি যে, বেদান্তদর্শন কেবল অরণ্যে ধ্যানলব্ধ নয়, পরন্তু ইহার সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুলি সাংসারিক কার্যে বিশেষ ব্যস্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই চিন্তিত ও প্রকাশিত। লক্ষ লক্ষ প্রজার শাসক সার্বভৌম রাজা অপেক্ষা অধিকতর কর্মব্যস্ত মানুষ আর কল্পনা করা যায় না, তথাপি এই রাজারা গভীর চিন্তাশীল ছিলেন।'[৮] আরও বলিতেছেন : 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত অগণিত অক্ষৌহিণী-পরিচালক অর্জুনের তুলনায় আমার কাজের তাড়না কিছুই নয়, তথাপি এই যুদ্ধ-কোলাহলের মধ্যে তিনি উচ্চতম দর্শনের কথা শুনিবার এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার সময় পাইলেন; সুতরাং আমাদের এই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ও আরামের জীবনে ইহা পারা উচিত।'[৯]

বেদান্তের আলোকে জীবনযাপন-রূপ প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্তের প্রধান অর্থ গীতাতেই করা হইয়াছে

বেদান্তের আলোকে জীবনযাপন ও কর্মানুষ্ঠান

মহাকর্মী রাজর্ষি নৃপতিগণই প্রধানতঃ উপনিষদের উপদেষ্টা। গীতার উপদেশও যুদ্ধক্ষেত্রে। অতএব কর্মবহুল জীবনেও বেদান্তচর্চা সম্ভব

এইসব উক্তিতে বিবেকানন্দ বলিতে চাহিয়াছেন যে, উপনিষদের ব্রহ্মাত্মতত্ত্বের এবং উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য ভগবদ্‌গীতার উদ্ভবও অরণ্যে বা গিরিগুহায় নহে এবং তাহার প্রয়োগ এবং সাধনাও কেবল অরণ্যবাসী বা গুহাবাসিগণের জন্য নহে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে বেদান্তের প্রয়োগ, বেদান্তের উপযোগ সম্ভব; শুধু সম্ভব নহে, প্রয়োগ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভক্তিতেও যেমন সকল মানুষই অধিকারী, তেমনি আত্মতত্ত্বের চিন্তায়, ব্রহ্মাত্মচিন্তায় সকল মানুষেরই অধিকার আছে। মুখ্য অধিকার না হউক, গৌণ অধিকার অবশ্যই আছে।

যেহেতু উপনিষদ্ ও গীতার উপদেশ অরণ্যে বা গিরিগুহায় নহে, অতএব উহার প্রয়োগ বা সাধনও অরণ্যে বা গুহায় সীমাবদ্ধ নহে

৭ বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২০; শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ২।৪৮

৮ তদেব, পৃঃ ২২০ ৯ তদেব, পৃঃ ২২৫

কারণ, সকলেই আত্মা, সকলেই ব্রহ্ম। এই স্থির সিদ্ধসত্যটি মানুষের নিকট হইতে গোপন রাখিয়া কোনই লাভ হয় নাই। বরং এই রহস্যটি সকলে জানিলে কিছু উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বিবেকানন্দ কর্মজীবনে বেদান্তের প্রসঙ্গেই বলিতেছেন : 'আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলে। ···বেদান্ত দৃঢ়ভাবে বলেন যে, প্রত্যেকেই এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।···আবাল-বৃদ্ধবনিতা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এই সত্য (আত্মার মহিমা) উপলব্ধি করিতে পারে—কোন কিছুই ইহাকে বাধা দিতে পারে না; কারণ বেদান্ত দেখাইয়া দেন, উহা পূর্ব হইতেই অনুভূত হইয়াছে*—পূর্ব হইতেই লব্ধ রহিয়াছে।'[১০]

বেদের অদ্বৈততত্ত্বের তাৎপর্য ও সত্য হইলে গোপন রাখা উচিত নহে

আত্মার শুদ্ধমুক্ততা, আত্মার মহিমা সকলেরই জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন

এ-পর্যন্ত প্রয়োগাত্মক বা practical বেদান্ত বিষয়ে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, বেদান্তের তত্ত্বসমূহকে—সত্যগুলিকে কর্মক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা, আত্মার শুদ্ধতা ও মুক্ততা স্মরণ রাখিয়া কর্মে অনাসক্ত ও ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত থাকিয়া সম ও শান্ত ভাব রক্ষা করিতে হইবে। বেদান্তের আলোকে জীবনযাপন করিয়া বেদান্তকে জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। নতুবা 'যদি কার্যে পরিণত (প্রতিফলিত) করা একেবারে অসম্ভব হয়, তবে বুদ্ধির একটু ব্যায়াম ব্যতীত কোন মতবাদের কোন মূল্যই নাই।'[১১]

জীবনে ও কার্যে প্রযুক্ত না হইলে অদ্বৈতবাদ বুদ্ধির ব্যায়াম মাত্র

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, বিবেকানন্দ 'practical' কথাটি একাধিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি অর্থই যুক্তিসঙ্গত ও বেদান্তশাস্ত্র-অবিরুদ্ধ। প্রথম অর্থটি এই যে, যদিও বেদান্তের সন্ন্যাসী সেবকগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন সন্ন্যাসীই বেদান্তের মুখ্য অধিকারী, তথাপি তাঁহারাই গৃহস্থাদির গৌণ অধিকার বা মন্দ অধিকার অস্বীকার করেন নাই। শঙ্করাচার্যও গৃহস্থের গৌণাধিকার স্বীকার করিয়াছেন। অপিচ, উপনিষদের ব্রহ্মাত্মতত্ত্বের আলোচনা যেরূপ পরিবেশে যেরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আত্মচিন্তা, ব্রহ্মচিন্তা সর্বাবস্থায় সকল স্তরের মানবই করিতে পারে। বিশেষতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে অব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক যুদ্ধব্যাপৃত ক্ষত্রিয় অর্জুনকে আত্মতত্ত্বাদি বেদান্তোপদেশের ঘটনার দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কর্ম-জীবনেও—ব্যবহারিক জীবনেও বেদান্তোপদেশের প্রয়োজন ও উপযোগিতা আছে।

'প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্ত' কথার প্রথম অর্থ—সর্বস্তরে, কর্মক্ষেত্রে ও ব্যবহারিক জীবনে ব্রহ্মাত্মচিন্তা আবশ্যক

* অর্থাৎ আত্মা অবিদিত নহে; 'অথো অবিদিতাদধি'—কেনোপনিষদ্, ১।৪; 'ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাৎ'—ব্রহ্মসূত্র, শঙ্করভাষ্য, ১।১।১

১০ বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৩ ১১ তদেব, পৃঃ ২১৯

॥ ৫ ॥

বিবেকানন্দের প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্ত

(প্রয়োগাত্মক বেদান্ত)

বিবেকানন্দের 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' বেদান্ত বা কর্মজীবনে বেদান্ত বা প্রয়োগাত্মক বেদান্ত একটি প্রসিদ্ধ, বহু আলোচিত বিষয়। Practical কথাটির আভিধানিক দুইটি অর্থ—theoretical বা তাত্ত্বিক-এর বিপরীত অর্থাৎ প্রয়োগাত্মক বা ক্রিয়াত্মক। আর একটি অর্থ পাওয়া যায়—feasible—প্রযত্নসাধ্য—অর্থাৎ অসম্ভব নহে। বিবেকানন্দ অবশ্য এই উভয় অর্থই গ্রহণ করিয়া নানাভাবে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার উক্তি হইতেই সেসবের আলোচনা করা হইতেছে। কোন পণ্ডিত ব্যক্তি নাকি 'প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্ত' দুর্বোধ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়া থাকেন। সুতরাং এই বিষয়টি ভালরূপে আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিশেষতঃ এই 'কর্মজীবনে বেদান্ত' বিবেকানন্দের একটি বিশেষ অবদান বলিয়া বলা হয়। বিবেকানন্দ নিজেই বিভিন্ন ভাষণে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আরও বলা হয় যে, বিবেকানন্দ গিরিগুহা ও অরণ্যস্থিত বেদান্তকে লোকসমাজে টানিয়া আনিয়াছেন—সমাজের সর্বস্তরে প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছেন। একমাত্র ইহার দ্বারাই—ব্রহ্মাত্মচিন্তার দ্বারাই সমাজের ও সর্বস্তরের মানবের উন্নয়ন—প্রকৃত উন্নতি সম্ভব—ইহা বিবেকানন্দ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই দেশে-বিদেশে অদ্বৈতবেদান্তের প্রচার, আত্মচিন্তা বা ব্রহ্মচিন্তার প্রচারই তিনি সর্বাধিক করিয়াছেন। যদিও সকলের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য তিনি অপরিহার্য সোপানরূপে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতিকে স্থান দিয়াছেন, তথাপি অদ্বৈততত্ত্বই যে চরম সত্য এবং সেই সত্যের সঙ্গে পরিচিত হইলে তবেই মানবের প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে, এ-বিষয়ে তাঁহার একটুও সংশয় ছিল না। অন্যান্য মতবাদের যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের দ্বারা মানবসমাজের যতটুকু ভাল হইবার হইয়া গিয়াছে। বেশী কিছু ভাল হয় নাই। সুতরাং এক্ষণে চরম সত্য অদ্বৈতবাদকে—অদ্বৈতভাবকে সকলের মনে পৌঁছাইয়া দিয়া পরীক্ষা প্রয়োজন। ইহা যদি বেদান্ত হয়—বেদ-প্রতিপাদ্য চরম সত্য হয়, তবে সুফল অবশ্যম্ভাবী।

প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্ত বিবেকানন্দের বিশেষ অবদান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও বস্তুতঃ ইহার একটি অংশ বা একটি দিকই অভিনব বা বিশেষ অবদান

বিবেকানন্দ সমাজের সর্বস্তরে বেদান্তের অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মচিন্তার প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছেন

দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতির প্রয়োজন ও মর্যাদা স্বীকার করিয়াও তিনি অদ্বৈতকেই মানবের উন্নতির শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করিয়াছেন

বিবেকানন্দ বলিতেছেন: 'অতএব বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে একান্তভাবে কার্যকর (practical) হইতে হইবে। আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে।'[১] এই উক্তির দ্বারা বিবেকানন্দ ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে বেদান্তকে শুধু তত্ত্ব বা দার্শনিক সিদ্ধান্তরূপে না রাখিয়া উহাকে জীবনে পালনীয় ধর্ম করিতে হইবে, তজ্জন্য ইহাকে কার্যকর অর্থাৎ কর্মে অভ্যসনীয় রূপ দিতে হইবে।

কিন্তু, বিবেকানন্দ এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, বেদান্তের যাহা চরম প্রতিপাদ্য নির্বিশেষ অখণ্ড চৈতন্যাত্মা বা ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব—তাহার কোনও জীবন বা কার্য নাই বলিয়া, তাহাতে কোন দ্বিতীয়ের স্থান নাই বলিয়া, তাহাকে জীবনে প্রয়োগ করিয়া কার্যকর করা সম্ভব নহে। তাই তিনি বলিয়াছেন: 'আদর্শ অবশ্য "বাস্তব" হইতে অর্থাৎ যাহাকে আমরা "কার্যকর" বলিতে পারি, তাহা হইতে অনেক উচ্চে।'[২] সুতরাং বেদান্তের যাহা চরম প্রতিপাদ্য, চরম লভ্য একত্বানুভূতি বা আত্মস্বরূপে অবস্থিতি তাহাতে কর্ম বা কার্যকরত্ব তো দূরের কথা, তাহাতে জ্ঞান বা ভক্তিও সম্ভব নহে—একথা তিনি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার স্বরচিত কবিতায়ও বলিয়াছেন: 'আছে মাত্র জানাজানি-আশ, তাও প্রভু কর পার।'[৩] অথবা অন্য এক কবিতায় বলিয়াছেন: 'মিশি সত্যে যাও এক হয়ে, মিথ্যা কর্ম-স্বপ্ন ঘুচে যাক।'[৪] প্রয়োগাত্মক বেদান্ত ও কর্মযোগ প্রচারকারী বিবেকানন্দের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। সুতরাং বেদান্তী সম্প্রদায়ে যেকথা প্রচলিত আছে—'ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।'[৫] অর্থাৎ অদ্বৈতভাবকেই সর্বদা অবলম্বন করিবে, ক্রিয়াতে কখনও অদ্বৈত হয় না—এই বিষয়েও বিবেকানন্দ সচেতন ছিলেন বলিয়াই উক্ত কথা বলিয়াছেন: 'আদর্শ অবশ্য বাস্তব হইতে—যাহাকে আমরা কার্যকর বলিতে পারি তাহা হইতে অনেক উচ্চে।' অথবা বলিয়াছেন: 'বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্বকে কর্মজীবনে টানিয়া নামানো যায় না।'[৬]

বেদান্তের চরম আদর্শ 'কার্যকর' হইতে অনেক ঊর্ধ্বে

---

১ বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১১

২ তদেব, পৃঃ ২২২

৩ তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৭২

৪ তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৯

৫ তত্ত্বোপদেশঃ, ৮৭

৬ **'The highest Advaitism cannot be brought down to practical life '—The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VI, Advaita Ashrama, Calcutta, Seventh Edition (1963), p. 122**

মুক্তির জন্য নয়, প্রত্যয় সৃষ্টির জন্য। আত্মবিশ্বাসের জন্য আত্মাতে বিশ্বাস। নিজের মধ্যে প্রবল প্রত্যয় গড়ে উঠলে কর্মের অনুষ্ঠেয়তা সম্পর্কে দৃঢ়চিত্ত হওয়া যায়। বিবেকানন্দ কর্মের জন্য আত্মবোধের উপর জোর দিয়েছেন। আত্মবিশ্বাসী মানুষ অসাধ্যসাধন করতে পারেন। বলেছেন, 'বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস— নিজের উপর বিশ্বাস— ঈশ্বরে বিশ্বাস— উন্নতিলাভের এই একমাত্র উপায়'। আত্মচৈতন্য থেকে যে বিশ্বাসের তৈরি হয়, নিঃশ্রেয়স কর্মে তা-ই হয় প্রধান প্রেরণা। গীতাতে 'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং' বলা হয়েছে। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে ভাষণ দেবার সময় বেদান্তের আত্মতত্ত্বের উপর জোর দিতেন এবং এদেশে কর্মতত্ত্ব ও রাজযোগের কথাই বেশি বলতেন। এর কারণ হল, নৈষ্কর্ম্য আমাদের সমাজ ও জীবনকে অলস প্রাণহীন করে তুলেছে এবং পাশ্চাত্যে ভোগ প্রবৃত্তি সমাজকে কল্যাণ আদর্শ থেকে বিচ্যুত করেছে। তাই আমাদের দেশে চাই কর্মোদ্যম, আর ওদেশে দরকার সংযম ও ধ্যান।

গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের আলোচনায় বিবেকানন্দ তাঁর প্রয়োগাত্মক বেদান্তের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। আসক্তিহীন কর্মের কথা বলেছেন— 'আমরা দেখিতে পাই, যে কার্যে আমরা আসক্ত হই, তাহারই সংস্কার থাকিয়া যায়' (কর্মরহস্য)। 'স্বার্থের জন্য কৃত কর্ম

দাসসুলভ কর্ম, আর কোন কর্ম স্বার্থের জন্য কৃত কি না, তাহার পরীক্ষা এই যে, প্রেমের সহিত যে-কোন কাজ করা যায়, তাহাতে সুখই হইয়া থাকে। প্রেম-প্রণোদিত এমন কোন কাজ নাই, যাহার ফলে শান্তি ও আনন্দ না আসে' (কর্মরহস্য)। তাঁর 'কর্মযোগের আদর্শ' প্রবন্ধে বুদ্ধের কথা বলেছেন— 'ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে, এবং সত্য যাহাই হউক না, সেই সত্যে লইয়া যাইবে'। বিবেকানন্দের ভাবনায় আত্মজ্ঞানই কর্মকে শুচি করে। তিনি জ্ঞানী হয়ে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের মতো কর্ম করতে নির্দেশ দিলেন। বললেন, 'You must remember that all work is simply to bring out the power of the mind which is already there, to wake up the soul. The power is inside every man, so is knowing ; the different works are like blows to bring them out, to cause these giants to wake up' (Karma-Yoga, Chap.-1)।

বেদান্ত এভাবে বিবেকানন্দের হাত ধরে ধ্যানের জগৎ থেকে কর্মের জগতে নেমে এল। ব্রহ্ম উপলব্ধির অতিলৌকিকতা থেকে লোকায়ত জীবনে অখণ্ড প্রেম ও ভালোবাসার অদ্বৈত অনুভবে রূপান্তর লাভ করল। তিনি তাঁর Practical Vedanta-র দ্বিতীয় বক্তৃতাতে

চেয়েছেন। বিবেকানন্দ বললেন, 'চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত প্রয়োজন ব্রাহ্মণের তত নয়। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশ জনের আবশ্যক'।

মানুষের স্বভাবগত রক্ষণশীলতাকে বিবেকানন্দ আঘাত করেছেন। বলেছেন, 'মানুষ যেখানে পড়িয়া আছে, সেখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না— তাহাকে দেবত্বে উন্নীত করিতে হইবে। ...আমরা যেন অপরকে ঘৃণার চক্ষে না দেখি। ...কারণ, প্রকৃতপক্ষে সবই সেই এক অখণ্ড বস্তুমাত্র। ...তাই অন্যে ঠিক আমাদের মতো উন্নতি করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করা উচিত নয়। কাহারও নিন্দা করিও না, সাহায্য করিতে পারো তো কর, যদি না পারো, হাত গুটাইয়া লও, সকলকে আশীর্বাদ করো, সকলকে নিজ নিজ পথে চলিতে দাও। গাল দিলে, নিন্দা করিলে কোন উন্নতিই হয় না' (বাণী ও রচনা-২য়)। এই বোধ, এই ভালোবাসা বেদান্তের একত্ব অনুভবেরই বাস্তব জীবনে কার্যকরী প্রয়োগ। বার বার আত্মার কথা শোনা বা ধ্যান করার কথা বলছেন তিনি ঃ " 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ'— এই আত্মার কথা প্রথমে শুনিতে হইবে। দিনরাত্রি শ্রবণ কর, তুমি সেই আত্মা। দিনরাত্রি পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকো, যে পর্যন্ত না ঐ ভাব তোমার প্রতি রক্তবিন্দুতে, প্রতি শিরায়

ও ধমনীতে স্পন্দিত হয়, যে পর্যন্ত না উহা তোমার মজ্জাগত হইয়া যায়...। তখন ঐ চিন্তাশক্তি প্রভাবে তোমার সমুদয় কর্মই পরিবর্তিত হইয়া উন্নত দেবভাবাপন্ন হইয়া যাইবে। ...আমি জানি, অনেকে এই সকল উপদেশ শুনিয়া ভীত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা এই ভাব কার্যে পরিণত করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রথম শিক্ষা। নিজেকে অথবা অপরকে দুর্বল বলিও না। যদি পারো লোকের ভাল কর, জগতের অনিষ্ট করিও না" (বাণী ও রচনা-২য়)। তাঁর 'রামেশ্বর ভাষণে' বলেছেন ঃ 'সকল উপাসনার সার— শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ-সাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী— সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন' (বাণী ও রচনা - ৫ম)।

বিবেকানন্দ তাঁর 'কর্মজীবনে বেদান্ত' শীর্ষক ভাষণগুলিতে ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম প্রভৃতি এবং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতির সাধনের আলোচনা করেছেন। অভ্যস-যোগের দ্বারা আয়ত্ত করে এগুলিকে জীবনে প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। জীবনে প্রযুক্ত না হলে বেদান্তজ্ঞান কেবল বুদ্ধির ব্যায়ামে পরিণত হয়ে যাবে। বস্তুতপক্ষে তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী যিনি চিত্তশুদ্ধি ও আত্মোপলব্ধির পর কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন— 'যস্তু ক্রিয়াবান পুরুষঃ স বিদ্বান্'। আত্মবোধের দরকার

পারিব, আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিব, যে-মুহূর্তে আমার ভিতরে এই ভাব আসিবে, সেই মুহূর্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইব— অন্য সবকিছুই অন্তর্হিত হইবে, আমি মুক্ত হইব' (বাণী ও রচনা-২য়)। ব্রহ্মের উপলব্ধি হল মুক্তির আনন্দ। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ঘটেছে বিবেকানন্দের অদ্বৈত ভাবনায়। তখন কেউ আর ছোট নয়, হীন নয়, অন্ত্যজ নয়— সকলেই সেই পরম এককের অভিব্যক্তি। এই বিশ্বাসে মানুষ পবিত্র ও শক্তিমান হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দের এই জীব ও শিবের অদ্বয় উপলব্ধি মানুষকে জাতিধর্মনির্বিশেষে এক দেবমহিমায় আলোকিত করল। তখন একমাত্র মানবত্বই সত্য বিবেচিত হল, জাতি ধর্ম বর্ণ প্রভৃতির বৈষম্য নিরর্থক হয়ে গেল। রামমোহনের থেকে আমাদের দেশে যে হিউম্যানিজমের পত্তন ঘটেছিল, বিবেকানন্দের মধ্যে এসে তা বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদে দীপ্ত হল। সমাজ জীবনে অতি সাধারণ এবং অস্পৃশ্য মানুষও অসামান্য হয়ে উঠল আপন মর্যাদা ও শক্তিতে। বিবেকানন্দের অদ্বয় উপলব্ধি মানুষ মাত্রকেই জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে এক দৈবী প্রভায় ভূষিত করল। তিনি মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তুললেন। বললেন, 'দুর্বল মানুষকে শুনাইতে থাকো, ক্রমাগত শুনাইতে থাকো ঃ তুমি শুদ্ধস্বরূপ, ওঠো, জাগো হে মহান— এই নিদ্রা তোমার সাজে না। ওঠ, এই মোহ

তোমার সাজে না। তুমি নিজেকে দুর্বল ও দুঃখী মনে করিও না। হে সর্বশক্তিমান, ওঠ, জাগো ; স্বরূপ প্রকাশ কর' (বাণী ও রচনা-২য়)।

বেদান্তকে কেবল তাত্ত্বিক বা দার্শনিক সিদ্ধবস্তুরূপে মনে না করে সংসারজীবনে পালনীয় ধর্ম হিসেবে গণ্য করতে ও জীবনে কার্যকর করতে বললেন তিনি। অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন ঃ 'বেদান্তের এই-সকল মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না ; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে— সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত হইবে। ...উপনিষদ-নিহিত তত্ত্বাবলী জেলে-মালা প্রভৃতি জনসাধারণ কিভাবে কার্যে পরিণত করিবে? ...যে যতটুকু পারে, করুক। জেলে যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে ; ছাত্র যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল আইনজ্ঞ হইবে। এইভাবে অন্যান্য সর্বত্র' (বাণী ও রচনা-৫ম)। অর্থাৎ সৎ, সুন্দর, সচ্চরিত্র, তেজস্বী হবার উপাদান নিজের মধ্যেই আছে। তাকে শুধু অনুভব করা এবং জাগিয়ে তোলা। কাউকে পবিত্র হতে হবে না কেননা পবিত্র আমরা আছি, কেবল তা অনুভব করতে হবে। তিনি

দাও। মানুষকে পাপী না বলিয়া বেদান্ত বরং ঠিক বিপরীত পথ দেখাইয়া বলেন: তুমি পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ; তুমি যাহাকে পাপ বল, তাহা তোমাতে নাই। পাপগুলি তোমার অতি নিম্নভাবের প্রকাশ; যদি পার, উচ্চতরভাবে নিজেকে প্রকাশিত কর। একটি জিনিস আমাদের মনে রাখা উচিত—তাহা এই যে, আমরা সবই পারি। কখনও 'না' বলিও না, কখনও 'পারি না' বলিও না। ওরূপ কখনও হইতে পারে না, কারণ তুমি অনন্তস্বরূপ। তোমার স্বরূপের তুলনায় দেশকালও কিছুই নয়। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার, তুমি সর্বশক্তিমান। (২: ২২৮-২৯)

শিখিব, জীবনের প্রতি মুহূর্তে, আমাদের প্রতি কার্যে কিভাবে সদসৎ-বিচার করিতে হয়, কিভাবে সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে হয়। আমাদের জানিতে হইবে— পবিত্রতা ও একত্বেই সত্যের পরীক্ষা। যাহাতে একত্ব হয়, যাহাতে মিলন হয়, তাহাই সত্য। প্রেমই সত্য, কারণ উহা মিলনকারক; ঘৃণা অসত্য, কারণ উহা বহুত্বের ভাব আনে—পৃথক করে। ঘৃণাই তোমা হইতে আমাকে পৃথক করে—অতএব ইহা অন্যায় ও অসত্য, ইহা একটি বিভাজনী শক্তি, ইহা পৃথক করে—বিনষ্ট করে। ...দেখিতে হইবে, আমাদের কর্মগুলি একত্বসম্পাদক না বহুত্ববিধায়ক। যদি বহুত্ববিধায়ক হয়, তবে ঐগুলি ত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি একত্বসম্পাদক হয়, তবে ঐগুলি সৎকর্ম বলিয়া জানিবে। চিন্তাসম্বন্ধেও এইরূপ। দেখিতে হইবে, উহা বহুত্ববিধায়ক বা একত্বসম্পাদক। ...ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পথ হইতে প্রশস্ত উদার দিবালোকে এস। মহৎ অনন্ত আত্মা কি করিয়া সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন? আমাদের সম্মুখে এই আলোকময় বিশ্বজগৎ রহিয়াছে, ইহার প্রত্যেকটি বস্তু আমাদের। বাহু প্রসারিত করিয়া—সমুদয় জগৎকে প্রেমে আলিঙ্গন করিতে চেষ্টা কর। যদি কখনও এরূপ করিবার ইচ্ছা অনুভব করিয়া থাক, তবেই তুমি ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছ। (২: ২৩৩, ২৫৩)

বেদান্ত বলেন, মানুষ ব্যতীত ঈশ্বর নাই। ইহা শুনিয়া তোমাদের অনেকের ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা ক্রমশঃ ইহা বুঝিবে। জীবন্ত ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, তথাপি তোমরা মন্দির-গির্জা নির্মাণ করিতেছ, আর সর্বপ্রকার কাল্পনিক মিথ্যা বস্তুতে বিশ্বাস করিতেছ। মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য অন্য জীবজন্তুরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানুষই

সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহল। যদি মানুষের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না। যে-মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যদেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব, যে-মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যের সম্মুখে শ্রদ্ধা সহকারে দাঁড়াইতে পারিব, আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিব, যে-মুহূর্তে আমার ভিতরে এই ভাব আসিবে, সেই মুহূর্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইব—অন্য সবকিছুই অন্তর্হিত হইবে, আমি মুক্ত হইব।

ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী উপাসনা। (২: ২৫১)

মুক্ত হও; অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা স্মরণ কর, তবে দেখিবে—তোমরা সর্বদাই অন্যের নিকট সাহায্য পাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছ, কখনও সাহায্য পাও নাই; যেটুকু সাহায্য পাইয়াছ, সব নিজের ভিতর হইতে। যে-কাজে তুমি নিজে চেষ্টা করিয়াছ, তাহারই ফল পাইয়াছ; তথাপি কি আশ্চর্য, তুমি সর্বদাই অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ। (২: ২৫৪-৫৫)

এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিলে আমাদের দৃষ্টি পরিবর্তিত হইয়া যায়। অনন্ত কারাস্বরূপ না হইয়া এ-জগৎ ক্রীড়াঙ্গনে পরিণত হয়, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না হইয়া ইহা ভ্রমরগুঞ্জনপূর্ণ বসন্তকালের রূপ ধারণ করে। পূর্বে যে জগৎ নরককুণ্ড বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহাই যেন স্বর্গে পরিণত হয়। বদ্ধের দৃষ্টিতে জগৎ এক মহা যন্ত্রণার স্থান, কিন্তু মুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহাই স্বর্গ—স্বর্গ অন্যত্র নাই। ...আমরা যখন মুক্ত হইব, তখন উন্মত্ত হইয়া সমাজ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বা গুহায় মরিতে যাইব না। তুমি যেখানে ছিলে সেইখানেই থাকিবে, তবে পার্থক্য হইবে এইটুকু যে, তুমি সমুদয় জগতের রহস্য অবগত হইবে। পূর্ব দৃশ্য—সবই আসিবে, কিন্তু উহাদের অর্থ তখন অন্যরূপ বুঝিবে। তোমরা এখনও জগতের স্বরূপ জান না; মুক্ত হইলেই কেবল উহার স্বরূপ বুঝা যায়। (২: ২৫৫-৫৬)

প্রত্যক্ষানুভূতি মননের ফল। মানুষ চিন্তা করুক। মৃত্তিকাখণ্ড কখনও চিন্তা করে না; মানিয়া লওয়া যাক যে, মৃত্তিকা সবই বিশ্বাস করে, তথাপি উহা মৃত্তিকাই থাকিয়া যায়। একটি গাভীকে যাহা ইচ্ছা বিশ্বাস করানো

সে পূর্ব হইতেই শুদ্ধ—তাহার সেই শুদ্ধ স্বভাব একটু একটু করিয়া প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। আবরণ চলিয়া যায় এবং আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। এই অনন্ত পবিত্রতা, মুক্তস্বভাব, প্রেম ও ঐশ্বর্য পূর্ব হইতেই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। (২ : ২২৪)

তীব্র কর্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার চির শান্তভাব! এই তত্ত্বকে 'কর্মরহস্য' বলা হইয়াছে, এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য। আমরা 'অকর্ম' বলিতে সচরাচর যাহা বুঝি অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা, তাহা অবশ্য আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। তাহা যদি হইত তবে তো আমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী দেয়ালগুলিই পরমজ্ঞানী হইত, তাহারা তো নিশ্চেষ্ট। মৃত্তিকাখণ্ড, গাছের গুঁড়ি—এইগুলিই তো তাহা হইলে জগতে মহাতপস্বী বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহারাও তো নিশ্চেষ্ট। আবার কামনামুক্ত হইলেই যে নিশ্চেষ্টতা কর্মে পরিণত হয়, তাহাও নয়। বেদান্তের আদর্শ যে প্রকৃত কর্ম, তাহা অনন্ত স্থিরতার সহিত জড়িত—যাহাই কেন ঘটুক না, সে স্থিরতা কখনও নষ্ট হইবার নয়—চিত্তের সে সমতা কখনও নষ্ট হইবার নয়। আর আমরা বহুদর্শিতার দ্বারা জানিয়াছি, কার্য করিবার পক্ষে এইরূপ মনোভাবই সর্বাপেক্ষা ভাল। (২ : ২২০-২১)

আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে, কারণ বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ দেন: বেদান্ত বলেন, এক প্রাণ সর্বত্র বিরাজিত। ধর্মের আদর্শসমূহ সমগ্র জীবনকে যেন আচ্ছাদন করে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তার ভিতরে যেন প্রবেশ করে এবং কার্যেও যেন ঐগুলির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ...তোমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, বেদান্তের মূলকথা—এই একত্ব বা অখণ্ডভাব। দুই কোথাও নাই, দুইপ্রকার জীবন নাই, অথবা দুইটি জগৎও নাই। তোমরা দেখিবে, বেদ প্রথমতঃ স্বর্গাদির কথা বলিতেছেন, কিন্তু শেষে যখন দর্শনের উচ্চতম আদর্শের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন ও-সকল কথা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। একটিমাত্র জীবন আছে, একটিমাত্র জগৎ আছে, একটিমাত্র অস্তিত্ব আছে। সবই সেই একটি সত্তা; প্রভেদ শুধু পরিমাণগত, প্রকারগত নহে। ভিন্ন ভিন্ন জীবনের মধ্যে প্রভেদ প্রকারগত নহে। (২ : ২১৯, ২২৫)

আমরা যেন অপরকে ঘৃণার চক্ষে না দেখি। আমরা সকলেই সেই লক্ষ্যের

দিকে চলিয়াছি। দুর্বলতা ও শক্তির মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত। আলো ও অন্ধকারের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রাগত, পাপ ও পুণ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রাগত, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রাগত; যে-কোন বস্তুর সহিত অপর বস্তুর প্রভেদ কেবল মাত্রাগত—পরিমাণগত; প্রকারগত নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে সবই সেই এক অখণ্ড বস্তুমাত্র। সবই এক—চিন্তারূপেই হউক, জীবনরূপেই হউক, আত্মারূপেই হউক, সবই এক; প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, মাত্রার তারতম্যে। তাই অন্যে ঠিক আমাদের মতো উন্নতি করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করা উচিত নয়। কাহারও নিন্দা করিও না, সাহায্য করিতে পার তো কর; যদি না পার, হাত গুটাইয়া লও; সকলকে আশীর্বাদ কর, সকলকে নিজ নিজ পথে চলিতে দাও। গাল দিলে, নিন্দা করিলে, কোন উন্নতিই হয় না। এভাবে কখনও কাহারও উন্নতি হয় না। অন্যের নিন্দা করিলে কেবল বৃথা শক্তিক্ষয় হয়। সমালোচনা ও নিন্দা দ্বারা বৃথা শক্তিক্ষয় হয় মাত্র; আর শেষে আমরা দেখিতে পাই—অন্যে যে দিকে চলিতেছে, আমরাও ঠিক সেই দিকেই চলিতেছি; আমাদের অধিকাংশ মতভেদ ভাষার বিভিন্নতা মাত্র।

এমনকি, পাপের কথা ধর। বেদান্তের ধারণা এবং 'মানুষ পাপী' ইত্যাদি ধারণা—এই দুইটি ভাবই কার্যতঃ এক, তবে একটি ভুল দিকে চলিয়াছে। প্রচলিত মত নেতিভাবাপন্ন, বেদান্ত ইতিভাবাপন্ন। একটি মত মানুষকে তাহার দুর্বলতা দেখাইয়া দেয়, অপরটি বলে—দুর্বলতা থাকিতে পারে, কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিও না; আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে। মানুষ যখন প্রথম জন্মিয়াছে, তখনই তাহার রোগ কি—জানা গিয়াছে। সকলেই জানে, নিজের কি রোগ; অপর কাহাকেও তাহা বলিয়া দিতে হয় না। আমরা বহির্জগতের সমক্ষে কপট আচরণ করিতে পারি, কিন্তু অন্তরের অন্তরে আমরা আমাদের দুর্বলতা জানি। বেদান্ত বলেন, কেবল দুর্বলতা স্মরণ করাইয়া দিলে বিশেষ কিছু উপকার হইবে না, তাহাকে ঔষধ দাও, মানুষকে কেবল সর্বদা রোগগ্রস্ত ভাবিতে বলা রোগের ঔষধ নয়—রোগ-প্রতিকারের উপায় নয়। মানুষকে সর্বদা তাহার দুর্বলতার বিষয় ভাবিতে বলা তাহার দুর্বলতার প্রতিকার নয়—তাহার শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই প্রতিকারের উপায়। তাহার মধ্যে যে-শক্তি পূর্ব হইতে বিরাজিত, তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া

বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্বত্র এইসকল তত্ত্ব আলোচিত হইবে, কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা—সে যে-কাজই করুক না কেন, সে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন—সর্বাবস্থায় বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।

৮॥ ব্যাবহারিক জীবনে বেদান্তকে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হয় ? ব্যাবহারিক বেদান্তের মূল নীতিগুলি কি ?

আমাদিগকে মতবাদ হইতে নামিয়া আসিয়া জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কিরূপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে—প্রত্যেক জাতির গার্হস্থ্য জীবনে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়: ...ইহা যে শুধু বনে অথবা পর্বতগুহায় উপলব্ধি করা যাইতে পারে, তাহা নয়। ...প্রথমে যাঁহারা এই-সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বনে অথবা পর্বতগুহায় বাস করিতেন না, অথবা তাঁহারা সাধারণ মানুষও ছিলেন না— আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে—তাঁহারা অত্যন্ত কর্মময় জীবনযাপন করিতেন, তাঁহাদিগকে সৈন্যপরিচালনা করিতে হইত, সিংহাসনে বসিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে হইত।

(২ : ২২৩, ২২৯)

বেদান্ত মানুষকে প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন। যেমন জগতে কোন কোন ধর্ম বলে—যে-ব্যক্তি নিজ হইতে পৃথক সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সে নাস্তিক; সেইরূপ বেদান্ত বলেন—যে-ব্যক্তি নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলেন। ...আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কার্যে পরিণত করা হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগতে যত দুঃখ কষ্ট রহিয়াছে, সেগুলির বেশির ভাগই দূরীভূত হইত। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে মহাপ্রাণ নরনারীদের মধ্যে যদি কোন প্রেরণা অধিকতর শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকে, তাহা আত্মবিশ্বাস। তাঁহারা এই চেতনাসহ জন্মিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহৎ হইবেন, এবং তাঁহারা মহৎ হইয়াছিলেন। ...মানুষে মানুষে

প্রভেদের কারণ—তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ভাব অথবা ইহার অভাব। এই আত্মবিশ্বাসের বলে সকলই সম্ভব হইবে। (২ : ২২৩, ২২৯-৩০)

বেদান্ত পাপ স্বীকার করেন না, ভ্রম স্বীকার করেন। আর বেদান্ত বলেন, সর্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম এই: নিজেকে দুর্বল, পাপী ও হতভাগ্য জীব বলা; এরূপ বলা যে, আমার কোন শক্তি নাই, আমি ইহা করিতে পারি না, আমি উহা করিতে পারি না। কারণ যখনই তুমি ঐরূপ চিন্তা কর, তখনই তুমি যেন বন্ধন-শৃঙ্খলকে আরও দৃঢ় করিতেছ, তোমার আত্মাকে পূর্ব হইতে অধিক মায়ার আবরণে আবৃত করিতেছ। অতএব যে-কেহ নিজেকে দুর্বল বলিয়া চিন্তা করে, সে ভ্রান্ত; যে-কেহ নিজেকে অপবিত্র বলিয়া মনে করে, সে ভ্রান্ত; সে জগতে একটি অসৎ চিন্তার স্রোত বিস্তার করে। ...হে সর্বশক্তিমান, ওঠ, জাগো; স্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি নিজেকে পাপী বলিয়া মনে কর, তোমার পক্ষে ইহা শোভা পায় না। তুমি নিজেকে দুর্বল বলিয়া ভাব, ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। এই কথা জগৎকে বলিতে থাক, নিজেকে বলিতে থাক— দেখ ইহার কি শুভফল হয়, দেখ কেমন বিদ্যুৎ-ঝলকে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, সব কিছু পরিবর্তিত হইয়া যায়। মনুষ্যজাতিকে ঐ কথা বলিতে থাক—তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি দেখাইয়া দাও। তাহা হইলেই দৈনন্দিন জীবনে ইহা অনুশীলন করিতে শিখিবে। ...আমরা দুর্বল বলিয়াই নানাবিধ ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা দুর্বল। আমি 'পাপ'-শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'ভ্রম'-শব্দ ব্যবহার করাই পছন্দ করি। আমাদিগকে ভ্রমে বা অজ্ঞানে ফেলিয়াছে কে? আমরা নিজেরাই। আমরা নিজ নিজ চোখে হাত দিয়া 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলিয়া চিৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, দেখিবে আলোক আমাদের জন্য সর্বদাই রহিয়াছে, সেই জীবাত্মার স্বপ্রকাশ আলোক। (২ : ২২৩-২৪, ২৩৩, ২৮৮)

বেদান্ত দৃঢ়ভাবে বলেন যে, প্রত্যেকেই এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এ বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নাই, বালক-বালিকার ভেদ নাই, জাতিভেদ নাই—আবালবৃদ্ধবনিতা জাতিধর্মনির্বিশেষে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে—কোন কিছুই ইহাকে বাধা দিতে পারে না; কারণ বেদান্ত দেখাইয়া দেন, উহা পূর্ব হইতেই অনুভূত হইয়াছে—পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। (২ : ২২৩)

মানুষ পূর্বে কিছুটা পবিত্র ছিল, আরও পবিত্র হইল—এমন নহে; বাস্তবিক

প্রকৃত আমিত্ব কি তাহা বুঝাইয়া দেয়। বেদান্ত বলে না যে, জগৎ বৃথা, অথবা উহার অস্তিত্ব নাই, বরং বলে—জগৎ কি তাহা বুঝ, যাহাতে জগৎ তোমার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে। (২ :২৪১)

৬॥ বেদান্ত কি শুধু একটি দর্শন ? অথবা, বাস্তব কর্মপন্থা ?

অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত করিবার উপায়—নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর; টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হইবে। যদি তুমি মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে—তাহা হইলে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে, পরমানন্দস্বরূপ নির্বাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভুল হইয়াছিল যে, এতদিন অদ্বৈতবাদ কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল—অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় নাই। এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাকে রহস্য বা গোপনীয় বিদ্যা করিয়া রাখিলে চলিবে না, এখন আর উহা হিমালয়ের গুহায় বনে-জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট আবদ্ধ থাকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু-সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটিরে, সর্বত্র—এমন কি রাস্তার ভিখারি দ্বারাও উহা কার্যে পরিণত হইতে পারে। (৫ : ৩৩৪-৩৫)

এখন অদ্বৈতবাদকে কার্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে—উহাকে এখন স্বর্গ হইতে মর্তে লইয়া আসিতে হইবে, ইহাই এখন বিধির বিধান। (৫ : ৩৩৫)

অদ্বৈতবাদের রহস্য এই যে, প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তারপর অন্য কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার। জগতের ইতিহাসে দেখিবে, যে-সকল জাতি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, শুধু তাহারাই শক্তিশালী ও বীর্যবান হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে ইহাও দেখিবে, যে-সকল ব্যক্তি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই শক্তিশালী ও বীর্যবান হইয়াছে। এই ভারতে একজন ইংরেজ আসিয়াছিলেন—তিনি সামান্য কেরানী ছিলেন, পয়সা-কড়ির অভাবে ও অন্যান্য

কারণে তিনি দুইবার নিজের মাথায় গুলি করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, এবং যখন তিনি অকৃতকার্য হইলেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল—তিনি কোন বড় কাজ করিবার জন্যই জন্মিয়াছেন; সেই ব্যক্তিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ। যদি তিনি পাদরীদের উপর বিশ্বাস করিয়া সারাজীবন হাঁটু গাড়িয়া বলিতেন, "হে প্রভু, আমি দুর্বল, আমি হীন", তবে তাঁহার কি গতি হইত? নিশ্চয় উন্মাদাগারেই তাঁহার স্থান হইত। লোকে এই-সকল কুশিক্ষা দিয়া তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আমি সমগ্র পৃথিবীতে দেখিয়াছি, দীনতা ও দুর্বলতার উপদেশ দ্বারা অতি অশুভ ফল ফলিয়াছে, ইহা মনুষ্যজাতিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সন্তানসন্ততিগণকে এইভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়—এবং ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, তাহারা শেষে আধপাগলগোছের হইয়া দাঁড়ায়? (৫ : ৩৩৪)

বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে একান্তভাবে কার্যকর হইতে হইবে। আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে, কারণ বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ দেন; বেদান্ত বলেন, এক প্রাণ সর্বত্র বিরাজিত। ধর্মের আদর্শসমূহ সমগ্র জীবনকে যেন আচ্ছাদন করে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তার ভিতরে যেন প্রবেশ করে এবং কার্যেও যেন ঐগুলির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। (২ : ২১৯)

উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মানুষ কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে—আমার কি দুর্বলতা নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতার দ্বারা কি এই দুর্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর করা যায়? উপনিষদ্ বলিতেছেন—হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল উপনিষদেই 'অভীঃ' এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ' বা ভয়শূন্য এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। 'অভীঃ'—ভয়শূন্য হও। (৫ : ১২৯)

উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে

আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মনুষ্য সমাজ ভুলিয়া গেলেও যেমন ঐগুলি বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্য সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিস্মৃত হইয়া গেলেও এগুলি থাকিবে।

এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কারকগণের নাম 'ঋষি'। (১: ১১-২)

৩॥ বেদান্তের মূল বক্তব্যটি কি সংক্ষেপে ও সহজভাবে বলতে পারেন?

আমি একটি গল্প বলিতেছি। শিকার-অন্বেষণে আসিয়া এক সিংহী একপাল মেষ আক্রমণ করিল। শিকার ধরিবার জন্য লাফ দিতে গিয়া সে একটি শাবক প্রসব করিয়া সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সিংহশাবকটি মেষপালের সহিত বর্ধিত হইতে লাগিল। সে ঘাস খাইত এবং মেষের মতো ডাকিত। সে মোটেই জানিত না যে, সে সিংহ। একদিন এক সিংহ সবিস্ময়ে দেখিল যে, মেষপালের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড সিংহ ঘাস খাইতেছে এবং মেষের মতো ডাকিতেছে। ঐ সিংহকে দেখিয়া মেষের পাল এবং সেই সঙ্গে ঐ সিংহটিও পলায়ন করিল। কিন্তু সিংহটি সুযোগ খুঁজিতে লাগিল, এবং একদিন মেষ-সিংহটিকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহাকে জাগাইয়া বলিল—'তুমি সিংহ।' সে বলিল, 'না', এই বলিয়া মেষের মতো ডাকিতে লাগিল। কিন্তু আগন্তুক সিংহটি তাহাকে একটি হ্রদের ধারে লইয়া গিয়া জলের মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বলিল, "দেখ তো, তোমার আকৃতি আমার মতো কিনা!" সে তাহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া স্বীকার করিল যে, তাহার আকৃতি সিংহের মতো। তারপর সিংহটি গর্জন করিয়া দেখাইল এবং তাহাকে সেইরূপ করিতে বলিল। মেষ-সিংহটিও সেইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং শীঘ্রই তাহার মতো গম্ভীর গর্জন করিতে পারিল। এখন সে আর মেষ নয়, সিংহ। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের সকলকে বলিতে চাই যে, আপনারা সকলে সিংহের মতো পরাক্রমশালী। যদি আপনাদের গৃহ অন্ধকারাবৃত থাকে, তাহা হইলে কি আপনারা বুক চাপড়াইয়া 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলিয়া কাঁদিতে থাকিবেন? তাহা নয়। আলো পাইবার একমাত্র উপায় আলো জ্বালা, তবেই

অন্ধকার চলিয়া যাইবে। ঊর্ধ্বের আলো পাইবার একমাত্র উপায় অন্তরের মধ্যে আধ্যাত্মিক আলো জ্বালা। তবেই পাপ ও অপবিত্রতারূপ অন্ধকার দূরীভূত হইবে। তোমার উচ্চ প্রকৃতির বিষয় চিন্তা কর; হীনতার কথা ভাবিও না। (৩: ১৪৯-৫০)

৪॥ আমি সাধারণ মানুষ। আমার পক্ষে কি বেদান্তের সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব?

তবে কি কোন আশা নাই? পরিত্রাণের কি কোন পথ নাই? মানবের হতাশ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এইরূপ ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল, করুণাময়ের সিংহাসন সমীপে উহা উপনীত হইল, সেখান হইতে আশা ও সান্ত্বনার বাণী নামিয়া আসিয়া এক বৈদিক ঋষির হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিল। বিশ্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ঋষি তারস্বরে জগতে এই আনন্দ সমাচার ঘোষণা করিলেন, "শোন, শোন অমৃতের পুত্রগণ, শোন দিব্যলোকের অধিবাসিগণ, আমি সেই পুরাতন মহান পুরুষকে জানিয়াছি। আদিত্যের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, তিনি সকল অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে; তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর অন্য পথ নাই।"

'অমৃতের পুত্র'—কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চান না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্তভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হইয়া তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছ, ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও, জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও। (১: ১৫)

৫॥ শুনেছি যে বেদান্ত জগৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়। এই কথা কি ঠিক?

বেদান্ত জগৎকে উড়াইয়া দেয় না, উহাকে ব্যাখ্যা করে। বেদান্ত ব্যক্তিকে উড়াইয়া দেয় না, ব্যাখ্যা করে—আমিত্বকে বিনাশ করিতে উপদেশ দেয় না,